একটি আধা অ্যাকাডেমিক (হাফ হার্টেড) প্রবন্ধ

অজিত চৌধুরী

এক

একদল ছাত্র নোটবুক চাইছে, পাঠকের একাংশ মেডইজি।

সহজ করে শেষতম হালচালগুলো বলে দাও এটা—এটাই—যদি দাবি হয় কিছু পাঠকের, আমি তাদের সঙ্গে নেই। দুঃখিত। সাহেবরা লিখবেন, কিছু ঝকঝকে ভারতীয় সেগুলোকে পৌঁছে দেবেন ইউনিভার্সিটি এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-গুলিতে, আর কিছু অসাধারণ মানুষ এইসব হট-কেক নিয়ে আসবেন সাধারণ মানুষের কাছে, বাংলায়, লিট্‌ল ম্যাগাজিন মারফৎ, এই যদি বাস্তব হয় তবে বাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মৃত্যু হোক। লিট্‌ল ম্যাগাজিন অ্যাকাডেমিসিয়ানদের তল্পিবাহক নয়। ইংরেজিতে লিখে—এবং কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করে—আমার বেশ নামডাক হয়েছে, এইবার আমজনতা আমার নাম জানুক এই মনে করে লেখক লিখল, পাঠক গিলল হালফ্যাশনের দর্শন (অর্থাৎ পশ্চিমী মতাদর্শগত প্রভুত্ব) পৌঁছে গেল বৈঠকখানায়, কিচেনে, হাউসওয়াইফরাও জেনে গেল কার কটা পাবলিকেশন, এই যদি লেখা হয়—লেখা যদি শুধুই পেপার হয় যা আজ ওজনদরে মাপা হবে এবং কাল কলেজ বাথরুমের দেওয়ালে শ্লোগান তবে নচিকেতা কী চেয়েছিল ?

আসল কথা রুখে দাঁড়ান যান্ত্রিক এবং উদ্ধত অ্যাকাডেমিসিয়ানদের বিরুদ্ধে। সত্তরের দশক থেকে ওদের বড় বাড় বেড়েছে—লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের লম্বা কিউ পড়েছে ওদের বৈঠকখানায় ঢোকার জন্য : একটা লেখার অনুবাদ দেবেন, স্যার ? সেই লেখা লেখ যা অ্যাকাডেমিক জার্নাল ছাপতে পারে না। লিট্‌ল ম্যাগাজিন অ্যাকাডেমিক জগতের এক্সটেনসন নয় ; অ্যাকাডেমিক জগতের কঠিন কথাগুলো—কোনো এ্যাকাডেমিক জগতের মুভমেন্ট (দেশী / ফোরেন)—সহজ করে অর্থাৎ ছোট ও সরলীকৃত করে, বলা নয়। লিট্‌ল ম্যাগাজিন আইডিয়া দেবে, অ্যাকাডেমিসিয়ানরা ইংরেজিতে টুকবে, পেপার করবে, কনফারেন্স করবে (মোড অফ প্রোডাকশন বা বেঙ্গল রেনেসাঁস ডিবেট)। সাহেবরা এখনই যা কিনবে না অ্যাকাডেমিসিয়ানরা তা ভাবে না—অ্যাকাডেমিক পেপার হল উজ্জ্বল চাকরবাকরদের লেখা। ভাঙ, ভাঙ, অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্স ভাঙ। লাল পতাকা হাতে নিয়ে যারা ইউনিভার্সিটি ভাঙতে গিয়েছিল তারা তো স্টেজ ছেড়ে চলে গেছে বহুদিন। তবুও তো খসে পড়ে ইট, বালি, চুন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির শরীর থেকে।

দুই

অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ লেখার একটি নির্দিষ্ট (বাঁধাধরা, গতানুগতিক) ছক আছে।

লেখক একটি আলোচনা প্রবাহে—ডিসকোর্সে—নিজেকে স্থাপিত করেন, ডিসকোর্সের অভ্যন্তরে প্রবেশপথগুলি নির্ধারণ করেন, ঢোকেন, আলোচনায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করেন : ইন্টারভেন করেন। 'এই ছিল,—আমি এই করলাম' অর্থাৎ অ্যাকাডেমিসিয়ান একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন (তৈরি করেন), তার সমাধান করেন—একই সঙ্গে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা।

লেখক কি এমন প্রশ্ন করতে পারেন যার উত্তর—একটি ফুলপ্রুফ উত্তর—তাঁর জানা নেই। লেখকের মনে একটি প্রশ্ন এসেছে, তিনি উত্তর খুঁজছেন, অন্ধকারে পথ হাতরাচ্ছেন, হোঁচট খাচ্ছেন—এটিই একটি প্রবন্ধের যথেষ্ট উপকরণ হতে পারে না ? শুধু প্রশ্ন করা—প্রবলেম ফর্মুলেট করা—এটিই কি কোনো প্রবন্ধের যথেষ্ট উপাদান নয় ?

পণ্ডিতেরা—যারা বিভিন্ন কমিটির এবং বোর্ডের মেম্বার, মানুষের যোগ্যতার নির্ধারণ করেন, ইন্টারভিউ নেন, থিসিস এগজামিন করেন, জার্নালগুলির রেফারী—বলবেন, না। এমন প্রশ্ন তুমি করতে পার না যার উত্তর তুমি জান না। যার অর্থ দাঁড়ায় : এমন প্রশ্ন তুমি করতে পার না যার উত্তর আমি জানি না। অর্থাৎ প্রশ্ন করতে পার না। এক প্রশ্নহীন এবং জিজ্ঞাসাবিহীন উত্তরপত্রের নাম অ্যাকাডেমিক পাবলিকেশন—কেউ কখনও একটা মডেল দিয়েছিল, তুমি শুধু তাতে ফুটনোট যোগ করে যাবে। আমার ভদ্রবন্ধু বলেছিল যে তার (ক্ষুদ্র) সাফল্যের মূলে আছে সাকসেসফুল—অর্থাৎ প্রভাবশালী ক্ষমতাবান—প্রফেসরদের এমন প্রশ্ন করার ক্ষমতা যার উত্তর তিনি জানেন অথচ ক্লাউড জানে না। অথচ প্রশ্ন করার এই খেলা তো চালিয়ে যেতেই হবে তা না হলে ভগবান বুদ্ধ—যিনি জন্মগ্রহণ করেন শুধুই উত্তর দেবার জন্য—কেমন করে কথা বলবেন।

অতএব আধুনিক গবেষকের প্রথম পাঠ হল মন থেকে সকল জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল মুছে ফেলা—চারিপাশের রিসার্চ পেপারগুলো যেন অফিসের ফাইলমাত্র। তাকে চটপট কিছু প্রশ্ন ভাবতে হবে যার কিছু সহজ এবং দ্রুত উত্তর আছে এবং অবশ্যাই প্রশ্নোত্তরগুলি তার সুপারভাইজারের আয়ত্তে। চটপট : কেননা সব রিসার্চপেপারই হল তেলেভাজা বা গণিকার শরীর যা ঠান্ডা হলে কেউ কেনে না।

অতএব সেই রিসার্চ ইনপুট কেন যা তুমি আউটপুটে পরিণত করতে পার চটপট এবং যার মার্কেটে একটি চাহিদা আছে। মনে রেখো : রিসার্চ প্রোডাক্টটি মার্কেটেবল হতে হবে—নতুবা তার কোনো মূল্য (ভ্যালু) নেই।

মার্কেটেবল করার ক্ষেত্রে প্রোডাক্টটির গুণ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করার আছে। যেমন : গবেষকের কুল ও গোত্র, কোন স্কুল এবং কলেজে পড়েছে সে, তার নিবাস, তার পিতা মাতা, তার প্রেমিকা কেমন—কলেজ স্ট্রিটের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরাও আজকাল চাইছেন যে তাঁর লেখকদের প্রেমিকারা স্মার্ট

এবং লাস্যময়ী হোন। সফলতর পুরুষের নারীটিকে উচ্চকুলোদ্ভবা এবং সফলতমদের ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গিনী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আর এইসব ভীড়ে সেই ছোট শিশুটি হারিয়ে যায় যে তার পিতাকে শুধু জিজ্ঞাসা করত "কেন ?" "আর একবার যদি কেন বলিস তো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব তোকে", বাবা বলেছিল। ছোট্ট শিশু নির্বিকার আবারও জিজ্ঞাসা করে "কেন ?" ওরা সবাই জানালা দিয়ে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বলছে, দেরে ছেলে, একটুখানি শক্তি ধার দে, একবার জানালার শিকগুলো ধরে এসটাবলিশমেন্টের দাদাদের এবং দাদাদের ঘিরে নেচে যায় থার্ডাকিড যারা তাদের বলি, "কেন ?"

এই কথাগুলি, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তোমাদের ইনোসেন্স ভাঙছে (তোমাদের মুখের মাংস সংকুচিত হচ্ছে)—যেন বালক-বালিকারা প্রথম জানছে তাদের জন্মর গুপ্ত বৃত্তান্ত, পিতামাতার পাপ। আধুনিক লেখকের একটি গ্রাম্যতা ছিল : আর সকল কিছুই যখন পণ্যর নিয়ম দ্বারা চালিত, সে, লেখক, পণ্যজগতের নিয়মের ঊর্ধ্বে। অথচ এই বাজার তার লেখা ছাপছে, তাকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে এবং নারী—লেখক ভান করে যে সে বাজারের নয়, সতী। পোস্টমডার্নিজম লেখকের ঘোমটা খুলে নিল : তুমিও আর সকলের মতো—বাজার থেকে জাত, আবার বাজারেই ফিরে আস। লেখা এক খেলা মাত্র, ম্যাজিক। মুখোস কখনও কারও মুখ হয় না এই বলে একটানে ডামির মুখোস খুলে দিয়েছিল ধর্মেন্দ্র, গুড্ডি ছবিতে। লেখক পারেনি।

পোস্টমডার্নিজম খুলে দিল।

অতএব মিথ্যা সতী সাজার ভান কোর না। আসলে সতীত্ব বলে কিছু নেই বোঝাটাই হল সচেতনতা। বাজারকে দেখ, জান, বোঝ, শরীর দিয়ে অনুভব কর, উপভোগ কর, জবালা মায়ের সন্তান তুই, কিসের ভয়, দেখ তো, তোর মা কতবার শুল পরপুরুষের সঙ্গে, তবু সে কেমন ইনোসেন্ট—কুড়িয়ে পাওয়া মা আমার, জবালা মা : ভারতবর্ষ।

কমোডিটির নিয়ম জান, শেখ, শেখাও, কমোডিটির সঙ্গে ফ্লার্ট কর, গরম থাকতে থাকতে বাজার থেকে তুলে নাও রিসার্চ টপিকগুলি যাতে বাজারে বিক্রি হয়, ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দাও—তোমার কথা। বাঁচবার জন্য এইসব তোমাদের শিখতে হবে—লেখাপড়া শেখার চেয়ে এই শেখাটা আরও বড়। শিখতে হবে কেমন করে মধ্য বয়সী সাকসেস-ফুল মানুষদের ইমপ্রেস করতে হয়। 'স্যার, আপনি খুব ভাল' বললেই চলবে না। এই শিক্ষা পরবর্তী জীবনে বসের সঙ্গে কথা বলতে সাহায্য করবে। আস্তে আস্তে তুমি শিখে যাবে কেমন করে মেয়ে বসদের (রাণীর) সঙ্গে কথা বলতে হয়, তার শরীরের দিকে তাকাতে হয়। মনে রাখার : অসংখ্য পার্টির মাতালদের ও লম্পটদের মাঝখান দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানো আপারক্লাস মহিলারা সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন বাঙালের নিষ্পাপ অকপট (অকপাট) চাউনি। সফলতা তারই জন্য যে যুবক স্থূলকায়া বসপত্নীর সঙ্গে পার্টিতে নাচতে পারে অপটিমাম বেসামাল : তুমি যাকে

দেখছ, স্পর্শ করছ সে রাণী—তোমার যুবকের চোখ শুধু রাণীকে কনফিডেন্স দিয়ে যাবে যে সে নারী।

আবার প্রফেসরের পিঠ চাপড়ানো এবং বসপত্নীর মিষ্টি হাসি মায়া মাত্র। লক্ষ্য : কমোডিটিটিকে ফরেন মার্কেটে বিক্রি করা। সাহেবদের বাজনায় নাচতে শেখ—সাহেবরা সহজে খায় এমন কিছু (ম্যাজিক, মিস্টিসিজম, ডেভলপমেন্ট ইকনমিক্‌স) ভাব, লেখ, প্রচার কর—আর সবই মায়া। কলোনিয়াল কালচারে তিনিই লেখক যিনি কোনো না কোনোভাবে সাহেবদের অনুগ্রহ পেয়েছেন। কলার তুলে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের কলার চেপে ধর, দেখবে কলারের তলায় শিকলের দাগ। মাঝে মাঝে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান শুন "সাহেব, তোমার বাজনায় আমি গাইছি, ভেবো না তুমি আমায় কিনছ"। (এটাই তো সুমনের গান, তাই না ?)

আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষে মার্কেটের—অর্থাৎ পশ্চিমী ডিসকোর্সের—বাইরে কোনো স্বাধীন ডিসকোর্স হতে পারে না। যারা এই দাবি করে তারা নিজেদের সঙ্গে ছলনা করে—বা আমাদের সঙ্গে। সেইডের পশ্চিমী ওরিয়েন্টাল ডিসকোর্সের ক্রিটিক পশ্চিমী ওরিয়েন্টাল ডিসকোর্সকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় মাত্র, যেখানে কালোমানুষেরাই সাহেবদের হয়ে ওরিয়েন্টাল ডিসকোর্স লিখছে। নিজেকে ভৃত্যরূপে—চেনো, নিজের জায়গা ভুল কোর না, ডমিন্যান্ট—অর্থাৎ পশ্চিমী ডিসকোর্সের মার্জিনে নিজেকে স্থাপিত কর, ওদের জেরা কর, মার্জিনে নিয়ে আস, খাদের কিনারায়, তখন বিদ্যুৎ চমকাবে, মেঘ ডাকবে, দেখ তো শুনতে পাও কিনা পিতামহর কণ্ঠস্বর : দ, দ দ।

তিন

আসলে আমরা যারা ভৃত্য খুব বেশি দর্শন লেখার প্রয়োজন বোধ করি না। শাসকদের শাসন কায়েম করার জন্য দিস্তের পর দিস্তে মিথ্যে কথা লিখতে হয় যার নাম দর্শন। আমাদের এই দায় নেই। আমরা পশ্চিমী লেখাগুলিকে জেরা করব, বিকৃত করব, আর ফাঁকে-ফাঁকে গুঁজে দেব আমাদের কথা। ওটাই হবে আমাদের লেখা। আমি এক বিখ্যাত পশ্চিমী দর্শনের প্রবন্ধ—ডেরিডার জোনস হপকিন্সের প্রবন্ধ যা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম দেয়—আলোচনা করব এবং তার প্রান্তে আমার কয়েকটি কথা বলব—একদম শেষে। তার আগে—ডেরিডা। আমার কথাগুলি বলব লুকিয়ে-চুরিয়ে। যেমন ডেরিডার বিরুদ্ধে আমি গীতা পোজিট করব, কিন্তু নাম করব মার্কস ও ফ্রয়েডের। আজ এইভাবেই প্রবন্ধ লিখতে হবে : সাদাকালো পাবলিক কনসাসনেসে মার্কস, ফ্রয়েড আছে ; গীতা, উপনিষদ নেই। আমাদের কালচার কত ভাল আমি সাহেব ও সাহেবচাটা মানুষগুলোকে বোঝাতে যাব না। আসল কাজ : কথাটা শোনানো, তা সে যে ভাবেই হোক না কেন। আমার কথা আমার মতো ভাবে আমি সকলকে শোনাব না—কেননা কথাগুলি সূর্যালোকে পড়া মাত্র শুয়োরের মাংস হয়ে যাবে। আমার কথা বলব আমি চুপিচুপি, বন্ধুদের।

মাস-কনসাম্পশনের জন্য কথাগুলি অনিবার্যভাবে বিকৃতভাবে অর্থাৎ পশ্চিমী মোড়কে রাখছি।

অতএব, ডেরিডা।

ডেরিডার ডিকনস্ট্রাকশন হল সব ধরনের স্ট্রাকচারড আলোচনার—স্ট্রাকচারালিজমের—বিরুদ্ধে এক জেহাদ, বিদ্রোহ। ডেরিডা তার 'স্ট্রাকচার, সাইন অ্যান্ড প্লে' প্রবন্ধটিতে এই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেটা ছিল ১৯৬৬ সাল।

তখন স্ট্রাকচারালিজমের হাওয়া বইছিল। স্ট্রাকচারালিস্টরা সাবেক হেগেলীয় এবং মার্ক্সীয় ধারার আলোচনার ঘরানাগুলো একের পর এক ভাঙছেন, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন। আদিপিতা: সস্যুর। এই নামগুলো বাতাসে ভাসছে: সস্যুর, ফ্রয়েড, লেভি স্ট্রাউস, অ্যালথুসার। অ্যালথুসার মার্ক্সিস্ট স্ট্রাকচারালিজম প্রবর্তন করেছেন—মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিস হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, একটা ব্রেক। ডেরিডা বললেন: যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন—যাহা হেগেল, তাহা স্ট্রাকচারালিজম। শুধু কতকগুলো নাম—ক্যাটিগরী—বদলে বদলে আসছে। দর্শনশাস্ত্র শুধুই তার পোশাক বদলায়।

স্ট্রাকচারালিজম নাম থেকে একটা কথা স্পষ্ট—যে স্ট্রাকচারালিজম একটা ছকের কথা বলে। হেগেলের দর্শনের এক ছক ছিল; স্ট্রাকচারালিস্টদের আর এক ছক। তবুও ছক। ডেরিডা বললেন যে দর্শনকে, কোনো আলোচনাকে এক নির্দিষ্ট দ্ব্যর্থহীন, বাঁধা ছকে ধরা যায় না। প্রতিপাদ্যটিতে বারুদ ছিল।

হেগেলীর দর্শন এক **সমগ্রের** কথা বলে যার **অংশ** রূপে মানুষ (রাষ্ট্রের অংশরূপে নাগরিক/বাজারের অংশরূপে মালিক ও শ্রমিক)। হেগেলীয় দর্শন একটি ধারণার মধ্য দিয়ে এই সমগ্রকে প্রকাশ করে যার নাম ইউনিভার্সাল। ইউনিভার্সালের উৎস থেকে অংশরূপে পার্টিকুলারেরা প্রবাহিত হয় (হেগেলীয় মার্ক্সবাদে: অর্থনৈতিক ভিত থেকে উপরিকাঠামো—রাজনীতি, সংস্কৃতি—বেরিয়ে আসে)। ইউনিভার্সাল, অতএব, একটি কেন্দ্র বা সেন্টার যা পার্টিকুলারগুলিকে ধরে রাখে।

স্ট্রাকচারালিজম বলল: উৎস নেই, সেন্টার নেই। যেমন অ্যালথুসারের স্ট্রাকচারালিজম বলে যে রাজনীতি এবং মতাদর্শগত দর্শনের উৎস কোনো অর্থনৈতিক দর্শনের ভিত নয়। উৎস নেই: প্রতিটি কাঠামোই অন্য কাঠামোগুলির দ্বন্দ্ব দ্বারা নির্ধারিত (ওভারডিটারমিন্ড)। বেস/গ্রাউন্ড/ইউনিভার্সাল/এসেন্স/সেন্টার নেই।

অথচ কাঠামোগুলি কোলাহল করে, মিলে-মিশে এক—সমাজ—হয়ে আছে, তার মানেই তো সেন্টার আছে, ডেরিডা বললেন। অ্যালথুসারের স্ট্রাকচারালিজম সমাজকে অনেকগুলি স্ট্রাকচারের স্ট্রাকচাররূপে দেখে। অর্থাৎ কোনো কিছু একটা আছে যা এই স্ট্রাকচারগুলিকে—অর্থাৎ অ্যালথুসারের আলোচনাকে—ধরে রাখে যা অ্যালথুসারের স্ট্রাকচারালিজম ব্যাখ্যা করে না। অতএব স্ট্রাকচারালিজমেও একটি সেন্টার

থাকে যা তার আলোচনার বাইরে। হেগেলের স্ট্রাকচারালিজম সেন্টারটিকে ধারণ করে ; স্ট্রাকচারালিজম তাকে বাইরে ঠেলে দেয়। অর্থাৎ সেন্টার থাকে।

ডেরিডা বললেন : সেন্টারটিকে বাইরে ঠেলার চেয়ে স্বীকার করে নাও না কেন যে আলোচনায় সব কিছু মিলবে না—কিছু বাইরে থাকবেই যারা তার চিহ্ন রেখে যাবে আলোচনাটিরই অভ্যন্তরে। আবার এই বর্জন এবং গ্রহণ তো সাবজেক্টই করে, তাই পুরো ব্যাপারটাই সাবজেকটিভ। কেন সাইন্স খোঁজ ?

ডেরিডা অবশ্য তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য অ্যালথুসারকে টেনে আনেননি, এনেছিলেন লেভি স্ট্রাউসকে।

আজকের স্ট্রাকচারালিস্ট সমাজবিজ্ঞানের উদ্‌গাতা লেভি স্ট্রাউস যিনি দেখিয়েছিলেন যে স্যাভেজদেরও মাইন্ড—মনন—আছে যা কাজ করে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে, আধুনিক গর্বিত মানুষের চেয়ে ভিন্নতর, অনেক সময় উন্নততর, রূপে। লেভি স্ট্রাউস স্যাভেজের মনন এবং তার পরিবার ও সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াটির কাঠামো ধরতে চেয়েছিলেন। স্যাভেজ ভাবে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে কোনো ধ্রুব—ইউনিভার্সাল—নিয়মাবলী দিয়ে স্যাভেজের সংসার বোঝা যায় না। স্যাভেজের মনন এবং সংসারকে নিয়মাবলী দিয়ে ধরা যায় এই অর্থে তার মননের একটি স্ট্রাকচার আছে কিন্তু কোনো বিশেষ নিয়ম দিয়ে তাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। শুধু একটি নিয়ম ছাড়া : ইনসেস্ট চলবে না। লেভি স্ট্রাউসের মতে যা ধ্রুব তাই প্রাকৃতিক ; এই অর্থে ইনসেস্টে বিধিনিষেধ প্রাকৃতিক। ডেরিডা এখানেই লেভি স্ট্রাউসকে খপ করে ধরছেন : কোনো কিছুই প্রাকৃতিক নয়, ইনসেস্টে বিধিনিষেধও একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার একটি (রক্তাক্ত) ইতিহাস আছে। প্রাকৃতিক ভাবে তো নয়ই, কোনো শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে মানুষ এই অবস্থানে পৌঁছয়নি। লেভি স্ট্রাউসের আলোচনা ইনসেস্টে বিধিনিষেধ এই সেন্টারটিকে ঘিরে আবর্তিত। ডেরিডা লেডি স্ট্রাউসের আলোচনার সেন্টারটিকে চিহ্নিত করলেন অর্থাৎ ভেঙে দিলেন ; দেখালেন : (লেভি স্ট্রাউসের) স্ট্রাকচারালিজমে একটি সেন্টার থাকে যা স্ট্রাকচারালিজম ব্যাখ্যা করে না। সবসময়েই কিছু না কিছু বাদ থেকে যায়।

ডেরিডা আর একটু বেশি বললেন : লেভি স্ট্রাউসের স্ট্রাকচারালিজম, প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো স্ট্রাকচারালিজম নয়—বেজায় এম্পিরিকাল। কিছু তথ্যকে তিনি একটি কাঠামোতে সাজিয়েছেন। নতুন তথ্য এল—কাঠামোটিও বদলে গেল। কোনো তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে কাঠামোটিকে তিনি বের করে আনেননি। তাই লেভি স্ট্রাউস যখন বলেন যে স্যাভেজের মননের এবং সংসারের অসংখ্য কাঠামো হতে পারে, প্রতিপাদ্যটির কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে না।

এখানেই ডেরিডার ইন্টারভেনশন : নিয়মাবলীর কাঠামো অসংখ্য—অসীম—হতে বাধ্য কেননা একটি কাঠামোতে সবসময়েই কিছু বাদ থাকে এবং এই গ্রহণ ও বর্জন যেহেতু

অন্তহীনরূপে হতে পারে—তা সে যেই করুক, স্যাভেজ অথবা লেভি স্ট্রাউস—সামাজিক কাঠামোর সংখ্যাও শেষহীন।

এখান থেকেই ডেরিডা তার ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্বের প্রস্তাবনা রাখেন। যে কোনো কাঠামোই—সমাজের বা পুস্তকালোচনার—গ্রহণ / বর্জন প্রক্রিয়া সাপেক্ষ। সাবজেক্ট (স্যাভেজ, স্ট্রাউস, ডেরিডা) অনুষঙ্গভিত্তিক এই গ্রহণ / বর্জন সমস্যাটির সমাধা(ন) করেন। যেহেতু প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন সাবজেক্ট, প্রক্রিয়াটি সাবজেকটিভ। পুরো ব্যাপারটাই সাবজেক্টের এক স্বাধীন—স্বেচ্ছাচারী—খেলামাত্র।

ডেরিডা প্রাথমিক ভাবে তাঁর অবস্থানটিকে এইভাবেই রেখেছিলেন। অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা, এলোমেলো, কয়েকটি বিস্ফোরক প্রতিপাদ্যকে ছুঁড়ে দেওয়া হল। যার পরবর্তী দশকগুলোতে পরিশোধিত, পরিমার্জিত, কখনও কিছুটা ভিন্নতর, রূপ দেন। যা আজ ডিকনস্ট্রাকশন নামে বিখ্যাত।

ডেরিডা শুধু একটি ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্ব (টেকনিক) রাখেন না। তার একটি দার্শনিক অবস্থান আছে : সবকিছুই সামাজিক—প্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। ডেরিডা লেভি স্ট্রাউসে শুধু এক হারিয়ে যাওয়া প্রকৃতি খুঁজে বেড়ান, দেখেন—লেভি স্ট্রাউস স্যাভেজের ভিতর এক প্রকৃতি খুঁজে নেন যা সম্পূর্ণ, কোনো কিছুই বাদ দেয় না। ডেরিডার কাছে এই প্রকৃতি এক অলস কল্পনামাত্র যা কোনোদিনই ছিল না। ডেরিডা কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামো—প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক—স্বীকার করেন না। সম্পূর্ণতা এক সম্ভাবনা মাত্র যার প্রকাশ—এবং বিকাশ—অসংখ্য সম্ভাবনার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। মানুষ শুধু এই অসংখ্য সম্ভাবনার ঢেউগুলিতে দুলবে, নাচবে, স্নান করবে। এই অবগাহনের নামই স্বাধীনতা, নীটসে বলেছিলেন। ডেরিডা আর একবার বললেন। প্রকৃতি নেই। শুধু সমাজ আছে তার অসংখ্য ঢেউ নিয়ে। এসো, ঢেউ-এর মাথায় মাথায় নাচি, ডেরিডা বললেন।

ডুব দেবার কথা ডেরিডা বলেননি। তাহলে তিনি প্রকৃতি খুঁজে পেতেন। তার আগে : প্রকৃতি কাকে বলে ?

ডেরিডার দর্শনে শব্দরা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না, মেটাফর মাত্র। শুধু একটি শব্দ ছাড়া : প্রকৃতি। অর্থাৎ ডেরিডার দর্শনেরও একটি সেন্টার আছে।

ডেরিডা প্রকৃতি দেখেন বাইরের পৃথিবীতে : স্যাভেজদের জঙ্গলে, মাঠে, ঘাটে বা মহাকাশে। ওখানে ফিরে যাবার কোনো পথ নেই, ডেরিডা বললেন : প্রকৃতি লেভি স্ট্রাউস বা রুশোর এক ঢিলে কল্পনা মাত্র। প্রকৃতি নেই, আছে শুধু—সমাজ। ডেরিডা দেখলেন না যে প্রকৃতি তাঁর খুব কাছেই ছিল, আপন অভ্যন্তরে। মাঠে ঘাটে জঙ্গলে মহাকাশে প্রকৃতি খুঁজলেন ডেরিডা, বুকের ভিতরটা খুঁজলেন না।

প্রকৃতি মানে স্ব-ভাব। প্রকৃতির কাছে ফিরে চলো মানে স্ব-ভাবের কাছে ফিরে চলো।

স্বভাব ধর্মের কাছে। ফ্রয়েড, মার্কস বা কৃষ্ণের শুদ্ধ পৃথিবীতে মানুষ স্বভাবের কাছে আসতে পারে, তাই সে—আনন্দিত।

মার্কস তার কমোডিটি ফেটিশিজমের আলোচনায় এই প্রশ্নগুলো তোলেন। পণ্য মানুষের আর সব পরিচয় মুছে ফেলছে, তাকে বিমূর্ত শ্রমিকে পরিণত করছে। মানুষ ভুলে যায় তার ভাললাগার মুহূর্তগুলি, তার কনক্রীট সত্তাকে। পণ্য সমাজ তার শরীরে কয়েকটি লেবেল সেঁটে দেয়: ডাক্তার, ইন্জিনিয়র, প্রফেসর, শ্রমিক। সে রোগী দেখে, ব্রিজ তৈরি করে, পেপার লেখে—ভুলে যায় যে একসময় কী সুন্দর পুতুল তৈরি করত, তার মাও তাকে দেখিয়েছিল আকাশের চাঁদ। মানুষ তার ভাললাগার কাজের জগৎ থেকে ছিটকে পড়েছে, সে কক্ষচ্যুত। সে ভ্রমণ করে এক সঙ্গহীন পৃথিবীতে যেখানে পণ্য তাকে মাপে, ওজন করে, বড় করে, ছোট করে, গ্রহণ করে, ছুঁড়ে ফেলে, তুলাদণ্ডের বাটখারার ওজনগুলিই সেখানে পরিবর্তনশীল, এক অচেনা পৃথিবীতে ভঙ্গুর অস্তিত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মানুষ—তার জীবনের স্বপ্নের মতো দূরে সরে যায় তাঁর ছোটবেলা। অথচ মানুষ তো লুকিয়ে আছে তার স্বপ্ন ও ছোটবেলায়, ফ্রয়েড বলেছিলেন। ভোরবেলার স্বপ্নেই থাকে জীবন।

মার্কস—ইয়ং মার্কস—মানুষের এসেন্সের কথা বলেছিলেন: স্বাধীন সচেতন কর্মবাসনা, স্বভাবকর্ম। পণ্য মানুষকে তার স্বভাব থেকে সরিয়ে আনে। একই কথাই পুনরাবৃত্তি পায় প্রাপ্তমনস্ক ক্যাপিটাল গ্রন্থে: পণ্য সমাজের পরিচয়হীন বিমূর্ত শ্রম মানুষকে তার কনক্রীট সত্তা—অর্থাৎ এসেন্স থেকে সরিয়ে আনছে। মানুষ তার প্রকৃতি, শরীর—মূর্তি—হারিয়ে বিমূর্ত অর্থাৎ প্রেত হয়। কিন্তু মানুষের—বিশেষ একটি মানুষের—এসেন্স কী? মানুষের কি কোনো ইউনিভার্সাল এসেন্স আছে? কনক্রীট সত্তা কাকে বলে? মার্কস উত্তর দেননি।

ফ্রয়েড মানুষের এসেন্সকে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন। সমাজ মানুষকে—তার এসেন্সকে—গিলে খায়; মানুষের পরিচয় থাকে সেইখানে যেখানে সমাজ অনুপস্থিত। তার ছোটবেলায় এবং যৌনজীবনে। ফ্রয়েড মানুষকে সেক্সে রিডিউস করেননি—সেক্স এবং শৈশবের স্মৃতির মাধ্যমে তার এসেন্সকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ফ্রয়েডের কাছে প্রশ্ন এই নয় যে এনভায়রনমেন্ট মানুষকে কী ভাবে প্রভাবিত এবং গঠন করে। ফ্রয়েড জানতে চান একই এনভায়রনমেন্টে মানুষেরা কেন ভিন্নভাবে রিএ্যাক্ট করে—তার অন্তঃপ্রকৃতি, এসেন্স। মানুষের কোনো ইউনিভার্সাল এসেন্স নেই;—মানুষের এসেন্সকে কতগুলি টাইপে ভাগ করা যায়। তাদের ভাললাগাগুলি আলাদা। প্রতিটি মানুষ তার ভাললাগার জগতে থাকবে, আদর্শ সমাজ এই ভাললাগার জগৎগুলির বিকাশ ঘটাবে। ফ্রয়েডে মার্কসের পরিণতি।

পণ্যসমাজ এই ভাললাগার জগৎগুলি মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু কোনো কিছুই কি মুছে ফেলা যায় সম্পূর্ণ? ডেরিডাই তো শিখিয়েছেন যায় না—যাই মোছ তার চিহ্ন থেকে যাবে, ট্রেস। উদ্ধত ক্ষমতা খুন করে মানুষকে, কিন্তু আত্মা—সে তো

মৃত্যুহীন। মানুষের চিহ্ন থেকে যায় তার স্বপ্নে এবং শৈশবের স্মৃতিতে। নিরালম্ব আত্মার মতো মৃতের স্বপ্ন ও স্মৃতি শরীর খুঁজে বেড়ায় : হ্যামলেট, হ্যামলেট।

প্রকৃতি আছে এইখানে, আমার স্বপ্ন ও স্মৃতিতে, অর্থাৎ আধ-জাগরণে। তাকে জাগরিত কর। আদর্শ সমাজ থাকে সেইখানে যেখানে স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রা মানুষকে জাগিয়ে রাখবে—জাগরণ নিদ্রার এক এক্সটেনসন। কাজ নেই। আমি ঘুমিয়ে থাকি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করি। ভালবাসি। ঢেউগুলি আসছে। আমি ডুবে যাচ্ছি। তুমি ডুবে যাচ্ছ। ঘুম। ঈশ্বরের মতো যোগনিদ্রায় শুয়ে থাকে মানুষ। কথাগুলি এলেমেলো লাগছে, বোকা বোকা, সেন্টিমেন্টাল, অদ্ভুত, তাই না? আমি কিন্তু আদর্শ সমাজ আর কোনোভাবেই বুঝতে পারি না। সাবেক সমাজবিজ্ঞান আদর্শ সমাজ খুঁজেছে একটা জাগরণ থেকে আর এক জাগরণে—ক্যাপিটালিজম থেকে সোস্যালিজম। এই প্রচেষ্টা মানুষকে ছোট করে, তার আরও বৃহত্তর সম্ভাবনাকে সাপ্রেস করে। ক্যাপিটালিজমের প্রান্তে—মার্জিনে—যে সম্ভাবনাগুলি ছিল তাকে বিনষ্ট করে।

ক্যাপিটালিজম মন্দ ; সোস্যালিজম ভাল। একবার সোস্যালিজমে পৌঁছলেই মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে এই চিন্তাই মানুষকে ভুলপথে চালিত করেছে। এই সমাজের প্রান্তেই—কিছুটা অন্য—জীবনযাপনের চিহ্ন থাকবে যাতে নতুন আদর্শ সমাজের কিছুটা ছবি থাকবে। ক্যাপিটালিজমে লড়াই, সোস্যালিজমে আদর্শ জীবন-যাপন—এরকম নয়। কমোডিটি ফেটিশিজম পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি নয়—আমার চেতনা আমাকে কমোডিটি ফেটিশিজমের উপরে তোলে, আমি অন্যরকমের জীবনযাপনের চেষ্টা করি—কিছুটা করিও—পণ্য সমাজের মানদণ্ড আমাকে (এবং আমার কমরেডদের) নির্ধারিত করে না। প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া মানে এই জীবনযাপন করা। মানুষ পণ্যের নিয়মকে অস্বীকার করে কিছুটা নিজের মতো বাঁচার চেষ্টা করে, বাঁচেও।

যতদূর দেখতে পাই, এই পণ্য সমাজের শেষ নেই। অতএব, এই পণ্য সমাজেই নিজেকে কিছুটা খুঁজে পেতে হবে। আজকের মানুষের কাছে এটাই চ্যালেঞ্জ : পণ্য সমাজের অভ্যন্তরেই নিজেকে আবিষ্কার করা। রুশো এটাই চেয়েছিলেন, লেভি স্ট্রাউস চান, আমি চাই যা ডেরিডা বোঝেন না। ওঁরা আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলতে পারেনি, আমি আছি। পণ্য সমাজের স্তুতি করতে-করতেই আমি গুঁজে দিই এক নিষিদ্ধ ইস্তাহার কমরেডদের হাতে। আমি পণ্য সমাজকে ডিসিভ করি। একই লেখার প্রান্তে থাকে অন্য লেখা ; যে যেভাবে নাও—বন্ধুরা, শত্রুরা।

চার

কেউই শেষ কথা বলে না। ডেরিডাও না।

ডেরিডা বললেন নেচার নেই। কেন বললেন? কেননা ডেরিডা নেচার কথাটিকে

একটিমাত্র অর্থে—এক্সটার্নাল ফিজিকাল নেচার অর্থে—বোঝেন, অর্থাৎ বোঝেন না। যে ডেরিডা সকল অর্থই কনটেক্সট নির্ভর বলেন, নেচার কথাটির অর্থও যে কনটেক্সট নির্ভর, বুঝলেন না—নিজেকে কনট্রাডিক্‌ট করলেন।

আমরা এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানের কনটেক্সট বদলালাম—পদার্থবিদ্যা থেকে জীববিদ্যা। তখন নেচার কথাটির অর্থ বদলে গেল, শরীরী হল। নেচার আছে—এইখানে, আমার শরীরে। তখন নেচার / সোসাইটি দ্বন্দ্ব মূর্ত হয় : সমাজ শরীরের উপর হামলে পড়ছে, রেপ করছে। নেচারে ফিরে যাওয়া মানে শরীরে প্রত্যাবর্তন, শরীরী জীবন-যাপন। নেচারকে আমরা স্বভাব অর্থে বুঝি। নেচার / সোসাইটি অপোজিশন মানে সমাজ ও স্বভাবধর্মের দ্বন্দ্ব। মানুষ স্ব-ভাবে ফিরতে চায়।

কেমন করে এই প্রত্যাবর্তন হবে, কোথায় বাধা, কেন, কীসের—এইসব প্রশ্ন এখানে অবান্তর, করছি না। আমরা শুধু সমস্যাটিকে রাখলাম : মানুষের ভিতরেই নেচার আছে। মানুষের এক স্বভাব ধর্ম আছে ; এই সমাজ মানুষকে তার স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত করছে। মানুষের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী বাঁচার আকাঙ্ক্ষাই অগণন ঢেউ হয়ে সমুদ্রতটে আছড়ে পড়ে প্রতিমুহূর্তে। মনীষীরা—কৃষ্ণ, মার্কস এবং ফ্রয়েড : আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। পোস্টমডার্নিজম আমার ভাললাগার ধারণাটিকে—স্বভাব-ধর্মকে—একটি রবারের ছোঁয়ায় মুছে ফেলতে চাইছে।

অর্থাৎ ওরা শরীর মুছে ফেলতে চাইছে। এসো, আমরা শরীরের কাছে যাই, স্বভাবের কাছে।

অথচ এই শরীর তো আমার শরীর নয় ; অন্য শরীর, যে কোনো শরীর, বিমূর্ত শরীর। —অর্থাৎ অশরীরী। কেমন করে জানব আমার এই শরীর কী চায়, চেয়েছিল ? চলো, যাই ছোটবেলার কাছে, নদীর কাছে, পুষ্করিণীর কাছে, বাথটাবে যেখানে মা তার শিশুটিকে স্নান করায়, শিশুটি সাঁতার কাটছে বাথটাবে, মাতৃগর্ভে। মাতা, দ্বার খোল।

নদীটি কি পারে তার উৎসে ফিরে যেতে ? এটিই ছিল ফ্রয়েডের প্রধান প্রশ্ন। ফ্রয়েড আমাদের ছোটবেলার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন : চাইল্ড ইজ দি ফাদার অফ ম্যান। ছোটবেলাকে খুঁজে বার কর।

নেচারের কাছে যাওয়া মানে শৈশবে এক প্রত্যাবর্তন যেখানে সমাজ সংকুচিত হয়ে ছিল। শৈশবকে ফিরিয়ে আন, ছোটবেলাকে, শরীরকে। সমাজ ক্রমশ ছোটবেলাকে আক্রমণ করে, ছোট করে, খাটো করে, হত্যা করে। আর যখন শৈশবই নেই, তখন তো আর স্মৃতি বলে কিছু রইল না—কেমন করেই বা আমাকে খুঁজে পাব আমি। শৈশবের মৃত্যুর আর এক নাম ইতিহাসের মৃত্যু। শৈশব নেই, তাই স্মৃতি নেই অতএব অবশেষ নেই ইতিহাস নেই।

এই পৃথিবীর সবাই জেগে উঠছে : গাছপালা, বাতাস, পাখি, নারী। সকলেই শুদ্ধ বাঁচার দাবি করছে। তখন শিশুটিকে কেন জেলখানায় বন্দী করে রাখ, ইস্কুলে ?

সোস্যালিস্ট নয়, ফেমিনিস্ট নয়, একমাত্র শিশুরাই পারে এক মুক্ত পৃথিবীর সন্ধান দিতে। শিশুদের বই না পড়িয়ে বই-এর মতো শিশুদের পড়, বোঝ, জান। শিশুদের চেন, শৈশবকে জান—তাহলেই বুঝবে তোমাকে, তোমার কনক্রীট যার আলোতে বাঁচ,—যদি ওরা বাঁচতে না দেয় (অবশ্যই দেবে না) বাঁচার দাবি তোল। মার্কস, ফ্রয়েড এবং শিশুদের হাত ধরে এক শুদ্ধ পৃথিবীর সন্ধান কর।

এই প্রবন্ধে আমি দাবি করব না যে আমি এক রত্ন ভূখণ্ড পেয়েছি যেইখানে আমার সঙ্গীদের নিয়ে যেতে পারি। আমি শুধু বলব যে এইখানে খনন কর—তামা, অভ্র এবং তেল পাবে। একটি পূর্ণ প্রবন্ধ লিখব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তো লেখাটি শুরু করি না। ওদের কথার ফাঁকেতে ফাঁকিতে আমাদের কথাগুলি গুঁজে দেব : আমরাও আছি। ব্যস এইখানেই তো প্রবন্ধ শেষ। এটি একটি 'অ্যাকাডেমিক পেপার' হতে পারত যদি আমি প্রবন্ধটিকে অংশ দুই এবং তিনেতে—ডেরিডার প্রবন্ধটির সারাংশ এবং তার সমালোচনায়—সীমিত রাখতাম। তার পরের বিচার্য বিষয় থাকত আমি সঠিক যুক্তি রাখছি কিনা, কতটা নতুন কথা বলছি, অর্থাৎ পেপারটি গ্রহণযোগ্য এবং পাবলিকেশনযোগ্য—কিনা। যা বিচার করবেন অ্যাকাডেমিক জগতের রেফারীরা।

কিন্তু পেপার তো আমি লিখছি না। আমি ফ্যাশনের জগৎ থেকে তুলে আনি কয়েকটি রুমাল যারা, সমবেত দর্শকেরা দেখে, পায়রা হয়ে যায় আমার মন্ত্রপূত হাতে। ফুকো, ডেরিডা, লাকাঁ, লিওটার্ড, বদ্রিলার্ড—এইসব সুধীজনেরা নামমাত্র (বিগ নেইমস) যাদের প্রান্তে আমি আমার কথাগুলি বলে যাব। সামান্যই কথা : আমি স্বভাবের কাছে যেতে চাই। তোমরা যারা ক্যাপিটালিস্ট, ব্যুরোক্র্যাট, প্রফেসর দার্শনিক, পুরোহিত তা হতে দেবে না। তাই আমার সত্তাকে আমি খণ্ডিত করলাম : একটি সত্তা তোমার সুপার মার্কেটের সামনে ম্যাজিক দেখায়—দেখাতে দেখাতে ফুসলে নিয়ে যায় তোমাদের ছেলেমেয়েদের। ওরিয়েন্টালিজম বা থার্ড ওয়ার্ল্ডিজম আমি কিছুই করি না। আমাদের কথা,—প্রাচ্যের কথা—বলার কোনো মানে নেই : সাহেবদের ফান্ডামেন্টালিজমের বদলে হিন্দু বা মুসলিম ফান্ডামেন্টালিজম। ওসব করবে সেইড এবং তার শিষ্যরা : সাহেবদের পাল্টা টোটালিটেরিয়ান সিস্টেম যা, প্রকৃত প্রস্তাবে, সাহেবদের কথা। আমার কথা বলার চেষ্টা আমি খুব করছি না : যা বাজারে রাখব,—গীতা বা রামায়ণ—শুয়োরের মাংস হয়ে যাবে। তার বদলে চুপিসাড়ে রেখে যাচ্ছি আমাদের কয়েকটি শ্লোক সাহেবদের প্রান্তে—ওরা বুঝতেও পারবে না যে আমি কখন ওদের ভিতর ঢুকে গেছি। সাধারণ মানুষ : খুব বেশি সিরিয়াস কথা তুমি বলতে যেও না। সেক্স, ভায়োলেন্স, বিদ্রোহ, অত্যাচার, ব্যাভিচার—যা বাজার নেয়—তার পাশে তোমার দুটি শ্লোক তুমি ভাসিয়ে দাও। তার বাইরে, ওগো ওয়ার্ল্ডের নাগরিক, অধিক কী ? বাজার : বাজারকে দেখ, বোঝ, জান, তাতে অংশগ্রহণ কর (অর্থাৎ আত্মগোপন কর) তারপর মার্কেট প্লেসে নগরীর যুবকদের বেচ নিষিদ্ধ মাদক ড্রাগ। আমি সক্রেটিস, এক ড্রাগ পেড্‌লার, হেমলক পান করার জন্য প্রস্তুত।

আর তখন অন্য সত্তা ধ্যান করে আন্ডারগ্রাউন্ডে। কী ভাবে, বলে, লেখে সে? ঘুমিয়ে থাকে? বিদ্রোহের জন্য তৈরি হয়? আসলে এই যে বিগ নেইমসের পাশে কয়েকটি কথা গুঁজে দিচ্ছি এগুলি কিন্তু আমার নয়, সবই মাটির তলা থেকে পাওয়া—যেমন মাটি খুঁড়ে পেয়েছি কয়লা, তেল এবং সোনা। মৃত গাছ মাটি চাপা পড়ে কয়লা হয়; মাটিতে পিষ্ট সভ্যতার কথাগুলি—সোনা। দ্বি-সহস্র বৎসর ব্যাপী একটি সভ্যতা স্ব-ভাব খুঁজেছিল—স্ব-ভাব নিয়ে ডিসকোর্স তৈরি করেছিল। বাজারের মদে তারই দুই-একটি বটিকা মিশিয়ে বিক্রি করি আমি। দেখো তো—নেশাটা আর একটু জমে কিনা? একমাত্র এইভাবেই থার্ড ওয়ার্ল্ডের লেখক কথা বলতে পারে—তার কথা। তা না হলে তো কথাগুলি বিক্রি—অর্থাৎ কম্যুনিকেটেড—হবে না। আর আগেই বলেছি যা বিক্রি হয় না তার কোনো ভ্যালু নেই। সেই আশ্চর্য সংকলনে আমারও দু-একটি শ্লোক থাকবে। তার বাইরে কে আমি?

লেখক বলতে তোমাদের মাথায় আসে কোনো এক বীরের কথা যে যুদ্ধজয় করে বা নারী, বিপ্লব করে বা তোলপাড় করে বেশ্যাবাড়ি, যে সমাজের মুখোস খুলে দেয়, ভিতর থেকে টেনে আনে শোষক এবং কামুককে, অত্যাচার এবং যৌনতা। তো, আমি এ সমস্ত পারি না—আমি শুধু আমার মুখোস খুলে যাই। এই আমি, খুলে ফেলেছি আমার মুখোস—আমার হাতে কোনো কলম নেই বা বন্দুক—দেখো তো, আমায় চিনতে পার কিনা?

আমি সমস্ত মুখোস খুলে তোমার কাছে দাঁড়াই। তখন তো আমি লেখক নই, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। ফ্রম রাইটিং টু স্পীচ। স্পীচ : সে তো একটা মেটাফর। কলম দিয়ে লিখলেই লেখা হল, আর মুখে বললেই স্পীচ—এ আবার কেমন কথা! স্পীচ হল কনটেক্সট অর্থাৎ অর্থের সংকোচন—কাছের লোকের জন্য বলা, লেখা। এটাই রুশো বলেছিলেন তার কনফেসনে—ডেরিডা বোঝেননি। উনি সকল শব্দকে মেটাফর অর্থে বোঝেন—শুধু বোঝেন না যে নেচার/স্পীচ শব্দগুলিও মেটাফর, তাদের বিশেষভাবে বোঝ, লেভি স্ট্রাউস বা রুশোকে পাবে।

তোমরা আমার লেখা পড়ছ, কিছু বুঝছ না তো? কেন ধরে নাও সকলকে সবকথা বোঝাবার জন্য আমি লিখছি। লেখা শুধু কম্যুনিকেট করে না, ডিসিভও করে। বিভিন্ন কমিটির মেম্বার, মধ্যবয়স এবং পঞ্চায়েত প্রধানদের অতিক্রম করে লেখা তার প্রেমিক খোঁজে। (কোথায় প্রেমিক তুমি : দীপ্তির ভিতরে।) এ লেখা তারই জন্য যে সব কিছু বুঝতে চায় না। কিছু বুঝলাম, কিছু না বোঝা রইল—তখন শরীরে এক আবেশ আসে, নেশা। ড্রাগ ছেড়ে লেখাটি তুলে নেয় সে যাকে তুমি ছুড়ে ফেলেছ মার্জিনে, আস্তাকুড়ে। আয়ারল্যান্ডের মানুষ, কলমকে ড্রাগে পরিণত কর। লেখা শুধু বন্ধদের সিগন্যাল পাঠাচ্ছে। বিকেল বেলার রোদ বেশ

এসে পড়েছে তোমার মুখে, হঠাৎ পোস্টম্যান নিয়ে এল আমার এই লেখা তোমার কাছে, তোমার মুখ বদলে গেল, তুমি হঠাৎ দরজা বন্ধ করলে। তোমার মেয়ে তখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মশগুল, জানল না যে ঘরে মার প্রেমিক এল।* □

* বুদ্ধিমানদের জন্য : এই লেখার শেষ অংশটি ডেরিডার রুশোর ডিকনস্ট্রাকশনের এক পাল্টা ডিকনস্ট্রাকশনের আইডিয়া রাখছে। বুদ্ধিমানেরা ইচ্ছা করলে পেপার করতে পারেন। আমার কোনো কপিরাইট নেই।